যে দেশে শিক্ষা নেই

আলী সানোয়ার

কদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গিয়েছিলাম। পত্রপত্রিকা দেখে ভেবেছিলাম পরিস্থিতি শান্ত, আবার শিক্ষার পরিবেশ ফিরে এসেছে।

গিয়ে হতবাক হলাম। সকাল সাড়ে ৯টায় সব দরজায় তালা। ক্লাসরুমে তালা, শিক্ষকের রুমে তালা এমনকি শিক্ষকদের লাউঞ্জও তালা মারা। ভাবলাম, হয়তো কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি আছে, তবুও এসেই যখন পড়েছি পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করি। তিনজন তিনজন করে মেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। নৃতত্ত্ব বিভাগের কাছাকাছি একদল মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম শিক্ষকরা কখন আসেন? তারা হেসে বললো, সাড়ে ১০টা-১১টার আগেতো নয়ই।

এর কিছুদিন আগে একটি বিভাগের চেয়ারম্যানকে ফোন করেছিলাম। বেলা ১২-২০-এ তার অফিসের লোকরা বললো, স্যার ১০ মিনিট আগে বেরিয়ে গেছেন। ভদ্রলোক তার একজন প্রিয় ছাত্রীর রেফারি হয়েছিলেন। ছাত্রীটি নৃতত্ত্ব বিষয়ক লেখাপড়া করেছে বলে গবেষণা বা চাকরির সুযোগের জন্য প্রায়ই আমাকে বিরক্ত করতো।একবার তার একটা কাজের ব্যবস্থা করার পর সে হঠাৎ বললো, আপনার জন্য দুঃসংবাদ আছে। আমার বাবা বলেছে, চাকরি-বাকরির দরকার নেই। আমি হতবাক। বলে কি, দিনের পর দিন বিরক্ত করার পরে শেষে কিনা এই খবর!

এর আগেও সে একটি গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রাথমিক বাছাই হয়েছিল। আমাদের ফরাসি কনসালট্যান্ট তখনই আমাকে বলেছিল, মেয়েটা নিজেকে যতোটা যোগ্য মনে করে আসলে সে মোটেই তা নয়। একে নিলে কাজে অসুবিধা হবে। কিন্তু মেয়েটি দাবি করলো তার মা আমার এক বোনের ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী এবং আবদার করলো গবেষণা সে করবেই এবং তার চাকরিটা যেন হয়। আমি আমার ফরাসি বন্ধুকে (তিনিও মহিলা) বলে এক রকম জোর করেই মেয়েটাকে প্রকল্পে নিলাম। নেওয়ার পর সে লাপাত্তা। জীবনবৃত্তান্তে যে ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল কুয়েত-মৈত্রী হলের, সেখানেও তাকে পাওয়া যায় না। আমি পড়লাম বিপাকে। মেয়েটি আবার ফার্স্ট ক্লাসও পেয়েছে। আমি উৎসুক হলাম জানতে সে কেন এ রকম করছে। দেখা হলেই কাকুতিমিনতি করে চাকরিইবা চাইতো কেন আবার চাকরি পাওয়ার পর পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? খবর নিয়ে জানলাম সে এইচএসসি ফেল করেছে। তার রেফারিকে যখন পেলাম– তিনি জানালেন যে, তিনি এর কিছুই জানেন না। কিভাবে রেফারি হলেন? চেয়ারম্যানের অগোচরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভঙ্গ করে ভর্তিই বা হলো কি করে? চেয়ারম্যান সাহেব গৌতম বুদ্ধের মৌনতা অবলম্বন করলেন।

পরে, অবশ্য জানা গেলো অন্য খবর। ছাত্রীটির বাবা এবং চেয়ারম্যান সাহেব একই গ্রুপের লোক। তাই নিয়মকানুন, কাগজপত্র সবটাই অপ্রাসঙ্গিক। তারা শিক্ষক মহলে বিএনপি-জামাত লবির লোক। এর বেশি আমি তদন্ত করিনি। করলে নির্ঘাত আমি এই দুষ্ট বলয়ে আরো অনেক অনিয়ম ও জালিয়াতি পাবো। তবে যেটা আমাকে বিস্মিত করেছে তা হচ্ছে, বাংলাদেশের রাজনীতি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। সামান্য একজন মফস্বল শিক্ষক একটি বিশেষ দলে থাকার সুবাদে কতোটা সুবিধা আদায় করেছেন। যারা আরো উচ্চ পদে আছেন তারা তা হলে কতোটা সুবিধা নিচ্ছেন! আমরা যারা সাধারণ নাগরিক, কোনো দল করি না- তাদের কি হবে? ছেলেমেয়েদের ভর্তি হতে শুরু করে রেজাল্ট এবং চাকরি পর্যন্ত আমাদেরও কি তদ্বিরে লেগে থাকতে হবে? আর যারা ক্ষমতাহীন তারা কি দিনদিন আরো পিছিয়ে পড়বে। দেশটা যাচ্ছে কোথায়? দল না করলে বাঁচা যাবে না? আর দল করলে সকল আইন ভঙ্গ করা যাবে। এই কি গণতন্ত্র? এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমি আর এক ছেলের কথা জানি সে চারুকলায় দ্বিতীয় কি তৃতীয় বর্ষে পড়তো। তার বক্তব্য অনুযায়ী তার বয়স ২৯ অর্থাৎ তার কমপক্ষে পাঁচ বছরের শিক্ষা-বাতায় ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী এক বছরের বেশি ব্যত্যয় হলে ভর্তির জন্য আবেদনই করা যায় না। এই দুই কৃতী ছাত্র সেটাকে সম্ভব করেছে। অবশ্যই শিক্ষক ও প্রশাসনের সহায়তায়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কি অবস্থা? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা জানালেন এখানে এ ধরনের অনিয়ম নেই তবে শিক্ষকরা বেশিদিন থাকেন না। ভালো চাকরি পেয়ে চলে যান। তাদের জ্ঞান বাংলাদেশের বাস্তব চাকরি জগৎ সম্বন্ধে অতি সামান্য। তবে ছাত্ররা শিক্ষকদেরও মূল্যায়ন করে এবং এমনও দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে ছাত্রদের মূল্যায়ন নেতিবাচক হওয়ায় একজন ফিলিপিনো শিক্ষকের চাকরি গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসনের একজন শিক্ষককে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে, এমনও দেখা যায় ক্লাস না করে 'এ' গ্রেড পাচ্ছে আবার নিয়মিত ক্লাস করে 'সি' গ্রেড পাচ্ছে। এর জবাব দিতে গিয়ে তিনি ক্ষেপে গেলেন। বললেন, এটা হতেই পারে, ছাত্রটি অত্যধিক মেধাসম্পন্ন। সে ক্ষেত্রে তার আর বিশ্ববিদ্যালয় আসা দরকার কি, আর আসলেও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-ই কি তার জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী নয়? ঐ শিক্ষক অভিযোগকারী ছাত্রকে নাস্তানাবুদ করলেন। আপনারা প্রশাসনকে জানিয়েছেন? কেন জানাননি? আন্দোলন করেন না কেন?

আজ আমাদের উচ্চশিক্ষাসহ শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই বেহাল ছাত্রছাত্রীদের যা একদিন ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার আজ তার জন্য 'ক্যারিয়ারের' ঝুঁকি নিয়ে তাদের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে এবং সে পরামর্শ দায়িত্ব অস্বীকারকারী একজন শিক্ষকের কাছ থেকে আসছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসা করেছি, কেন তারা সমাজে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারছেন না? অপ্রাসঙ্গিকভাবেই তারা জানালেন, আমরা কয়েকটি জায়গায় ক্লাস খুলেছি। তাহলে আর উন্মুক্ত রইলো কই? এ কাজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ই করতে পারে?

বিলেতে গণমাধ্যমের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতি ষাটের দশকে চালু হয়। ইউরোপীয় অন্যান্য দেশেও প্রায় একই সময় তা চালু হয়। তারা রেডিও, টেলিভিশন উভয় মাধ্যমেই ব্যবহার করছে। ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন করছে তারা উত্তর পাচ্ছে। দূরশিক্ষণ ও স্বশিক্ষণ এখন অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ থেকে শুরু করে মার্কিন আইভি-লীগ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত শিক্ষা পদ্ধতি। সুদূর বিলেত থেকে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতি বছর বাংলাদেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে 'এ' লেভেল, 'ও' লেভেল করছে অথচ আমরা গাজীপুর থেকে টেকনাফ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা সংযোগ স্থাপন করতে পারছি না।

এই বিষবৃক্ষ ধ্বংস করতে হলে আমাদের অবশ্যই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আইনের আওতায় আনতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ স্বচ্ছ আত্মনিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো তৈরি করতে হবে এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো আন্তঃক্রিয়াশীল হতে হবে।

বাংলাদেশে কথাটা নতুন শোনালেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিকায়ন সংক্রান্ত জ্ঞান সম্বন্ধে যাদের ন্যূনতম খোঁজ-খবর আছে তারা জানেন আধুনিক রাষ্ট্রের জাতিসত্তার বিকাশ যেসব দেশে ঘটেছে তা গণমাধ্যমের আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমেই। যাঁরা গণমাধ্যমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেনি ও একে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যম হিসেবে অবহেলা করে চলছে সেসব দেশে স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরও জাতীয় মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেনি। আধুনিক রাষ্ট্রও গড়ে ওঠেনি।

দুঃখজনক হলেও সত্য, স্বাধীনতার ২৮ বছর পর আমরা এ সব প্রশ্নের জবাবতো দূরের কথা-প্রসঙ্গও তুলিনি। শুধু সমস্যা আর সঙ্কটের জঞ্জাল বাড়িয়েছি।

কারণও আছে। এ সব অপ্রিয় সত্য কথা বলে কেউ সমাজচ্যুত হতে চায় না; হয় তারা এই পঙ্কিল বাস্তবতা মেনে নেয় অথবা মেধাভিত্তিক, জ্ঞানভিত্তিক শিল্পোন্নত দেশগুলোতে পাড়ি জমায়। কেননা, সবারইতো একটাই জীবন, তাদেরওতো একটা ভবিষ্যৎ আছে। তাদেরই বা কি করার আছে। জাতি ব্যস্ত ট্রানজিট নিয়ে, সস্তা রাজনীতিতে।

অপ্রিয় সত্য কথা বলে কেউ সমাজচ্যুত হতে চায় না, হয় তারা এই পঙ্কিল বাস্তবতা মেনে নেয় অথবা মেধাভিত্তিক, জ্ঞানভিত্তিক শিল্পোন্নত দেশগুলোতে পাড়ি জমায়। কেননা, সবারইতো একটাই জীবন

আলী সানোয়ার : লেখক